মুখবন্ধ

বাংলাদেশে, বিপুল প্রতিশ্রুতির এক অনিবার্য নিয়মে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা। এই আন্দোলনের ধারা আজও অব্যাহত। তবুও এই আন্দোলনের মূল সময় চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক বলে, বিশ শতাব্দীর অবসানে তার একটা নিরপেক্ষ মূল্যায়ন চলে। এই আন্দোলন, যা কিনা গণ-আন্দোলনেরই একটি অংশবিশেষ, সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে আজ চিহ্নিত করা খুব জরুরি বলে মনে হয়। আর সেই আগ্রহ থেকেই প্রবৃত্ত হয়েছি আমাদের বর্তমান আলোচনায়।

গবেষণাপত্রটির শিরোনাম 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও আধুনিক বাংলা কবিতা'। 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন' কথাটা খুব প্রচলিত, বস্তুত সেই অর্থেই অন্তর্গত এই শিরোনাম ব্যবহৃত। বাংলাদেশে (এবং ভারতবর্ষেও) লেখকদের সংঘবদ্ধ সাহিত্যরচনার প্রয়াস ও এ বিষয়ে গড়ে তোলা আন্দোলন এই প্রথম সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, যে-কারণে, একে সাহিত্য আন্দোলন বলতে সম্ভবত আপত্তি থাকার কথা নয়। আধুনিক শব্দটিরও আলাদা আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করিনি, কেননা, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মূলত যে মার্কসবাদী চিন্তাধারা নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল, তা অবশ্যই আধুনিক, তাছাড়া, সমসাময়িক জীবনপ্রবাহকে উপজীব্য করে তার যে সজীব আত্মপ্রকাশ, কোনভাবেই তা অনাধুনিক নয়। প্রগতির সংজ্ঞা নিয়ে নানাজনে নানা কথা বলেছেন। প্রগতি আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনায় সেসব কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। এখানে বরং প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে সমস্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষণ ফুটে উঠেছিল তার কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করি। এই আন্দোলনের আন্তর্জাতিক লক্ষণগুলি আমাদের মতে এইরকম:

১। যে কোন রাষ্ট্রের টোটালিটারিয়ান তথা স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে দলমতনির্বিশেষে গণতান্ত্রিক-মোর্চা গঠনের প্রয়াসকে অব্যাহত রাখা

২। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও তজ্জাত যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

৩। সামন্ততান্ত্রিক সমস্তরকমের মূল্যবোধের বিরোধিতা করা

৪। পুঁজিবাদী সভ্যতার অবক্ষয় দর্শানো

৫। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোয় আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি মর্যাদাপ্রদর্শন

৬। শান্তির জন্যে, শান্তির সপক্ষে কথা বলা

৭। শিল্পের জন্যে শিল্প, এই তত্ত্বের বিরোধিতা এবং শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা

৮। সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা, উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করা

মোটামুটি এই কয়েকটি লক্ষণ 'যুব-তুর্কী' শিল্পীদের সাহিত্য-সংস্কৃতিগত মূল ভিত্তি, বাংলা সাহিত্যে

এই আন্তর্জাতিক লক্ষণগুলিই বিকশিত হয়ে অঙ্গীকৃত হয়েছে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহে:

১। সমাজজীবনের গভীরে প্রবেশ

২। সমাজের অন্তেবাসী জীবন, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতির দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন

৩। বিশেষত শ্রমিক, কৃষক তথা সমাজের বৃহত্তর গণজীবনের মর্ম আবিষ্কার

৪। শ্রেণীচেতনার বিকাশ, শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচন ও শ্রেণীশোষণের কথাকে সমৃদ্ধ প্রকাশ

৫। রচনায় অধিক দুঃখ, অধিক দারিদ্র্যের প্রকাশ

৬। সৃষ্টিশীল রচনায় লেখকের ব্যক্তি-সাপেক্ষতা নয়, সামষ্টিক-চেতনার বহিঃপ্রকাশ

৭। আঙ্গিক ও প্রকরণে সরলতাকে স্বীকৃতি, বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষের শোষণযন্ত্রণা

৮। সৃষ্টিশীল রচনায় দুরূহতা পরিহার, দুর্বোধ্যতাকে অস্বীকার

৯। ভাষা হবে জীবন্ত, জনগণের আপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষা যা গণসাহিত্যকে স্পষ্ট করে তোলে, এইভাবে জনগণের সঙ্গে শৈলীগত যোগসাধন

১০। সামাজিক বাস্তবতাসম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও রোমান্টিক ভাবালুতা পরিহার

১১। অবাস্তব মধ্যবিত্তসুলভ আবেগ পরিহার, বুদ্ধি, যুক্তি ও মননকে প্রাধান্য

১২। যৌন-উদ্দীপক বা যৌন-অনুসারী বিষয়বস্তু পরিহার

১৩। জীবনদর্শনে মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার অনুসরণ

১৪। শিল্প-সাহিত্যে লোককলা, লোকজীবন, লোকসংস্কৃতির প্রতি গুরুত্বপ্রদান

১৫। বর্তমান বা সাম্প্রতিকতাকে অগ্রাধিকার

১৬। অতীত নয়, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের কথাকে উজ্জ্বলতর করা

১৭। রচনার সমাপ্তিতে আশাবাদের উদ্ঘোষণা

১৮। সর্বোপরি রাজনীতি তথা বৈপ্লবিকতাকে অগ্রাধিকার প্রদান

এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে আলাদা প্রকাশ পেয়েছে এমন নয়, একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে আছে। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে কমবেশি এই বৈশিষ্ট্যগুলিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

আলোচনার কালসীমা নির্দেশ করেছি ১৯০৫থেকে ১৯৫০খ্রীষ্টাব্দ অবধি। আমাদের দেশে ১৯৩৬খ্রীষ্টাব্দ বেশ উল্লেখযোগ্য, এই সময়েই সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়। কিন্তু তারও আগেকার সূত্র নির্দেশ না করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া একটু কঠিন। কয়েকজন ভারতীয় ১৯৩৩-৩৪খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের এক রেস্তোরাঁয় বসে ভেবে নিলেন কিভাবে লেখক সংঘ গঠনের মাধ্যমে ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো যায়। সাজ্জাদ জহীর, মুলকরাজ আনন্দ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই ভাবনাটা মাথায়

দেশে ভারতে ফিরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ ব্যাপারে জোড়জোড় শুরু করেন। প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক সুধী প্রধান মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, এই সময়েই একটি খসড়া ইস্তেহার রচিত হয়েছিল। অন্ধ্রের কবি স্বর্গত আল্লুরি রামা রাওয়ের কাছে এটি দীর্ঘকাল ছিল। কিন্তু তা উদ্ধার করা হয় নি। এইসব নানা কারণে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দকেই আমরা এর উদ্ভবকাল হিসেবে ধরেছি। এই আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। লক্ষ করবার, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর, বিশেষ করে শান্তি-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের বৃহত্তর তাৎপর্য সাহিত্যে আর কোন ব্যাপক আবেগ সঞ্চার করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ফলে তিরিশ-চল্লিশের দশকে বাংলাদেশে লেখকদের সৃষ্টিশীল মনের উৎস খুলে দিয়েছিল। চিন্তা-চেতনার জগতে একে 'দ্বিতীয় রেনেসাঁ' বলা যায়। এই সময়কার বিভিন্ন সাহিত্যশাখায় (যেমন--গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি) প্রগতি সাহিত্যের প্রভাব নির্ণয় প্রায় দুরূহ ব্যাপার। কাজেই, সাহিত্যের কবিতার শাখায় প্রগতি আন্দোলনের দীর্ঘায়িত রূপটিই আমাদের আলোচনার জন্যে গ্রহণ করেছি। আলোচনার জন্যে অগ্রগণ্য কবি হিসেবে বেছে নিয়েছি সমর সেন, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। এঁদের লেখবার ধারাকেই মোটামুটি অনুসরণ করে ও পুষ্ট করে তুলেছেন এমন কবিদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছি মোট আটজন কবিকে। এঁরা হলেন----অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এঁদের সাধারণ কিন্তু বিশিষ্ট পরিচয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বলা দরকার, কবি হিসেবেই এঁদের বেছে নিইনি, এঁরা কোন-না-কোনভাবে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অথবা মার্কসীয় বা অন্যভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্য পোষণ করতেন। এই যুগে আরও অনেক কবিই তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এখানে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়, এঁদের অজস্র রচনা বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে ঠাঁই পায় নি, অন্তর্ভুক্ত হয় নি কোন সংকলনে---তাই এই অনালোকিত অন্ধকার ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করা আমার পক্ষেও সম্ভব হল না।

এইসব কবিতাগুলি সংগ্রহের কাজ ও আলোচনা আলাদা অভিনিবেশ দাবি করে। তাছাড়া, এসব ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের কাজটা একটু কঠিন। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে গবেষণার কাজ সীমাবদ্ধ সময়ের। দ্বিতীয় অসুবিধে, কোন বিশেষ দলের হয়ে কাজ না করলে বিশেষ বিশেষ লাইব্রেরী-ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া কঠিন। তৃতীয় অসুবিধে, সেইসব প্রবীণ সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী, যাঁরা বয়সের ভারে অত্যন্ত শিথিল স্মৃতি নিয়ে রয়েছেন অথচ তথ্যগুলি যাচাইয়ের অন্য কোন দ্বিতীয় উপায় জানা নেই। অনেক কর্মী আবার 'বাস্তবতার' কারণে 'সাক্ষাৎকার' দিতে নারাজ। যদিও তাঁদের স্মৃতিগুলো বেশ মূল্যবান।

যাই হোক, আমাদের সমগ্র আলোচনাকে মোটামুটি চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও বিকাশসম্পর্কিত আলোচনা এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধের ও ব্যাপারটি। এর প্রবল প্রতিক্রিয়ায় সারা পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদও সাহিত্যিকগণ কিভাবে সম্মিলিত হন, ফ্যাসিবিরোধী জোটগঠনের মাধ্যমে কি ধরনের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন তাও আলোচিত হয়। প্রসঙ্গত 'যুক্তফ্রন্ট' থিসিসের কথাও এসেছে। এই থিসিস দেশে দেশে কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে জোট গঠনের পরামর্শ দেয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেও এর বিশেষ প্রভাব পড়ে। এই অধ্যায়ের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে প্রগতিশীল ঐতিহ্য হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। সেইসঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও সামান্য বিশ্লেষিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্রগণ্য কবিদের আন্দোলনের সংস্পর্শজাত কবিতার আলোচনা ও পরবর্তী অংশে অপ্রধান কবিদের সাধারণ আলোচনা। শেষ অধ্যায়ে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলির বিশ্লেষণ।